লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে

শামসুর রাহমান

ছেলেবেলায় আমাদের শেখানো হয়েছিল, লেখাপড়া করে যে/ গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। ছন্দ-মিলের জন্যে হোক কিংবা একটি আশাপ্রদ ভবিষ্যতের কথা ভেবেই হোক এই ছড়াগন্ধী বাক্যটি পড়ার সময় মন বেশ দুলে উঠতো। পাঠ দুলে দুলেই করতাম। লেখাপড়া জিনিসটা যত তেতো আর কঠিনই হোক না কেন, এলেমদার হলে নিদেনপক্ষে গাড়িঘোড়া যে হাসিল করা যাবে, এরকম আশা খুব অল্প বয়সেই করতে শিখেছিলাম। সেকালে যখন বাক্যটি লেখা হয়েছিলো, তখন বোধহয় আমাদের দেশে মোটরকারের চল হয়নি। যখন ছোট ছিলাম, তখন এই ঢাকা শহরে কুল্লে একটি কি দু'টি মোটরকার, হাওয়া গাড়ি নামে অধিক পরিচিত, রাস্তায় সগৌরবে প্রায় উড়ে বেড়াতো। বর্তমানে অনেক কিছুই ওলট পালট হয়ে গেছে; এখন ঢাকা শহরে মোটরকার গিজ গিজ করছে।

যাকগে, লেখাপড়ার উপযোগিতা বোঝাবার উদ্দেশ্যে ছেলেবেলাতেই আমাদের মনে সুকৌশলে লোভ ঢুকিয়ে দেয়া হতো। লেখাপড়া করো, গাড়ি পাবে, ঘোড়া পাবে, ব্যস তার পর মজাসে ঘোড়া-জোতা রঙচঙে গাড়িতে চেপে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে। সচ্ছল জীবনের কথা বোঝাতেই যে গাড়ি আর ঘোড়ার অবতারণা করা হয়েছিল তা সহজেই মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। সেই যে রূপকথায় বলা হতো, অমুক কাজটা করতে পারলে রাজা টুকটুকে একজন রাজকন্যা এবং অর্ধেক রাজত্ব পাবে, অনেকটা সেরকম আর কি। রূপকথাতেও সচ্ছল জীবনের টোপ। মোট কথা, বাল্যকালেই লোভের হাতছানি দেখার শিক্ষা পেতাম আমরা। লেখাপড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য কি গাড়ি আর ঘোড়া পাওয়া? বাড়ি করা? লেখাপড়া করার যে অন্য উপকারিতা রয়েছে, এই শিক্ষা অবহেলিত থেকে যেতো। ছেলেবেলায় অন্য উপযোগিতার কথা বললে হয়তো বুঝতেই পারতাম না। ঘোড়া-গাড়ি বালকের পক্ষে যতটা চিত্তাকর্ষক অন্য কিছু ততটা নয়। লেখাপড়া করলে চিত্তের প্রসার ঘটে, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়, মূঢ়তা-বিরোধী যাত্রায় পাথেয় সঞ্চয় করা যায়; মনে অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিশীলতা জাগ্রত থাকে। এসব ব্যাপার কোমলমতি বালক-বালিকার মাথায় ঢুকবে না, এই বিবেচনায় তখন এগুলো শেখানো হয়নি।

বাস্তব কিন্তু ভিন্ন মেজাজের শিক্ষক। বাস্তব আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে এমন কিছু দেখিয়ে দেয়, শিখিয়ে দেয় যেজন্য সব সময় আমরা প্রস্তুত থাকি না। সেই পাঠ পাঠ্য কেতাবের বহির্ভূত। আমরা বাস্তবে দেখতে পাই কেউ কেউ লেখাপড়া করে অবিশ্যি ঘোড়া-গাড়ি পায়, কিন্তু অধিকাংশই গাড়ির গদি অথবা ঘোড়ার লেজ, কিছুই ছুঁতে পারে না। এমনও দেখা যায়, লেখাপড়া তেমন করেনি, টেনেটুনে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল মারার ব্যাপারে হ্যাট্রিক করেছে যে লোকটা সে দিব্যি মোটরকার হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে আর যিনি ইয়া মোটা মোটা বই পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী হাসিল করেছেন, বিস্তর জ্ঞান অর্জন করেছেন, তিনিই হয়তো সেই মোটরকারের মালিকের গাড়ির ধুলো খাচ্ছেন কিংবা গাড়িচাপা পড়ছেন। বোধহয় এজন্যেই কোনো কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি আমাদের ছেলেবেলায় শেখা বাক্যটি কিঞ্চিৎ পাল্টে লিখেছিলেন, 'লেখা পড়া করে যে/গাড়িচাপা পড়ে সে।' যারা পণ্ডিত জ্ঞানসাধক তারা সাধারণতঃ উদাসীন পথচারী, এটাই কি বোঝাতে চেয়েছেন সেই কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি? না কি অন্য কিছু?

লেখাপড়া বিষয়ে নানা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। সেই কূটকচালে না গিয়ে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে, যে-কোন সভ্য মানুষের পক্ষে লেখাপড়া অপরিহার্য। আর আমাদের দেশে লেখাপড়ার হাল খুবই শোচনীয়। বাংলাদেশের শতকরা আশিভাগ লোকই নিরক্ষর। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ সাফল্যের সঙ্গে পেরিয়ে এসেছেন তারাও ছাত্রজীবনের পর সস্তা থ্রিলার ছাড়া অন্য কোন বই ছুঁয়ে দেখেন না। খুব কম লোকই ছাত্রজীবনের পরেও পাঠাভ্যাস বজায় রাখেন। কোনমতে ডিগ্রী পকেটে গুঁজে একটা চাকরি বাগাতে পারলেই মানবজন্ম সার্থক হলো ব'লে মনে করে তারা। চাকরি-বাকরির হিল্লে হলে আর চাই কী। ওরে ভাই জয়ধ্বনি কর। সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি আর ইতিহাস-চর্চা করার? এমনিতে যায় যদি দিন কেটে যাক না।

সত্যি বলতে কি, আমাদের জাতীয় জীবনে নিরক্ষরতা এক নিদারুণ অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে না পারলে আমরা কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডুকতা থেকে কখনো রেহাই পাবো না। কাজী নজরুল ইসলাম যতই বলুন, 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান/ তুমি মোরে দানিয়াছো খৃষ্টের সম্মান'—দারিদ্র্য মোটেই কাম্য নয়। জীবনে দারিদ্র্য শুধু লাঞ্ছনা ও বঞ্চনাই আনে না, মানুষের মনকেও সংকীর্ণ করে তোলে; দারিদ্র্যের উৎপীড়নে অনেকের ওপর হীনতা ভর করে। অশিক্ষার পক্ষে কালো হাওয়ায় ডানা বিস্তার করে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি। শিক্ষাবিদ ও সুপণ্ডিত ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, মনে পড়ে প্রায়শঃই বক্তৃতা ও ভাষণে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে বলতেন। তাঁর ভাষায় তখন ফুটে উঠতো মিশনারির উদ্দীপনা। তিনি জ্ঞানের সাধনা করতেন বলেই জানতেন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটলে জাতি কখনো অগ্রসর হতে পারবে না। দেশের কল্যাণের স্বার্থেই নিরক্ষরতা দূরীকরণ এমন জরুরী ছিল তার বিবেচনায়।

তবে শুধু তথাকথিত শিক্ষা লাভ করলেই যে মানুষ কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি পায় না, একথা আমাদের সমাজের দিকে নজর দিলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিরক্ষরদের কথা বাদই দিচ্ছি, বহু শিক্ষিত লোককেই দেখেছি বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক খেতে, দেখেছি প্রগতি-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হতে। যুক্তিশীলতা ও মুক্তবুদ্ধিকে সহজে বিসর্জন দিয়ে তারা মেতে থাকেন মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণায়। শিক্ষার আলোর পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে তারা অন্ধকারের দিকে যাত্রা করেন। সারাজীবন তারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন রকমারি কুসংস্কারে। তারা ক্রমাগত প্রতারিত হতে থাকেন সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি দ্বারা। বিজ্ঞান চর্চা করেন যে অধ্যাপক তিনি যখন অবৈজ্ঞানিক অপসিদ্ধান্তে উপনীত হন, গোঁড়ামির শিকারে পরিণত হন, তখন হতাশ হতে হয় বৈকি। কিছুকাল আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি প্রোগ্রাম দেখেছিলাম। সেই প্রোগ্রামে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের একজন প্রবীণ অধ্যাপক ইসলামি বিজ্ঞান সৃষ্টি করার কথা বলছিলেন জোরেশোরে। একদা এই অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন; সেই সূত্রে আমি তার ছাত্র ছিলাম। তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এখন তিনি বছরের সিংহভাগই বিদেশে বসবাস করেন, কিছুদিনের জন্যে বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন এবং এলেই তার শ্মশ্রুশোভিত মুখ টেলি-পর্দায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কী করে যে তিনি ইসলামি বিজ্ঞান সৃষ্টির কথা বলতে পারলেন, সে কথা ভেবে হতচকিত হয়ে গেলাম। এতকাল ইসলামি দর্শন, মুসলিম স্থাপত্য ইত্যাদির কথা শুনে এসেছি। কিন্তু ইসলামি বিজ্ঞানের কথা কস্মিনকালেও কানে আসেনি। আমরা তো আর বিদেশে আস্তানা গাড়িনি, এমন জ্ঞানগর্ভ কথা শুনবো কী করে? শুনি আর না-ই শুনি, অন্ততঃ এটুকু জানি, বিজ্ঞান বিজ্ঞানই। বিজ্ঞান কখনো হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান হতে পারে না। কেউ কি কখনো আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বকে ইহুদী বিজ্ঞানের নমুনা হিসেবে পেশ করেছে?

যেখানে শিক্ষিতদেরই এই হাল সেখানে নিরক্ষরদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তাদের শিক্ষিত করে তোলার মতো তেমন উল্লেখযোগ্য উদ্যম এবং উদ্যোগ নেই। সরকার শিক্ষা প্রসারের কথা হরহামেশা বলেন বটে, কিন্তু সে পথ সুগম করার জন্যে তাদের কোনো সদিচ্ছা কিংবা প্রচেষ্টা আছে বলে মনে হয় না। পুঁজিবাদী সমাজে নির্ধনদের শিক্ষিত করে তোলা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ঘুমন্ত সিংহকে খামোকা জাগিয়ে কি লাভ? থাক সে ঘুমিয়ে। সে ঘুমিয়ে থাকলেই ধনীরা নিরাপদ তন্দ্রায় অবসর মুহূর্ত আরাম আয়েসে কাটাতে পারবে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দেশীয় তল্পিবাহক ও তাঁবেদার গোষ্ঠীও নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে। তাদের বাড়া ভাতে কেউ ছাই দিতে পারবে না। 'হুজুরের অপূর্ব শাসন' ও কায়েম থাকবে পুরোদমে। নিরক্ষরদের শিক্ষিত করে তোলা মানেই বিপদ ডেকে আনা। নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারা। তারা শিক্ষা পেলে অনেক কিছু জানতে পারবে। কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা প্রভৃতির অন্ধকার পর্দা তাদের দৃষ্টিপথ থেকে অপসারিত হবে। তারা জানতে পারবে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও সেতুঙ প্রমুখের কথা। শ্রেণী বৈষম্য, ধনের সুষম বন্টন, শ্রেণী সংগ্রাম, বিপ্লব ইত্যাদি শব্দ শুনলে ধনীদের এবং তাদের সাঙাৎ পেয়াদা রাজনৈতিক টাউট, বিক্রীত বুদ্ধিজীবী, নষ্ট সাংবাদিক এবং অসাধু ধর্মব্যবসায়ীদের এলার্জি হয়। তাই প্রকৃত শিক্ষাই নিরক্ষর নির্ধনদের এদের খপ্পর থেকে বাঁচাতে পারে। কেননা শিক্ষিত হলে কারা তাদের মিত্র আর কারা শত্রু, এটা চিহ্নিত করা সহজ হবে তাদের পক্ষে। এই চিহ্নিতকরণ মস্ত একটা কাজ। কাজটি ঠিক মতো করতে পারলে, শ্রেণী সংগ্রামে জয়ী তারা হবেই। তখন তারাও গাড়িঘোড়া চড়তে পারবে। গাড়িঘোড়া অল্পসংখ্যক বিত্তবানদের একচেটে ব্যাপার হয়ে থাকবে না আর।